দৈনিক বাংলা

তারিখ 0 3 OCT 1987
পৃষ্ঠা 8 কলাম 4

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘড়িবাবুর সময় শেষ

খায়রুল আনোয়ার

বয়সের ভারে অনেকখানি নুয়ে পড়েছেন। প্রায় প্রতিদিনই আসেন ক্যাম্পাসে। আজ কলাভবন, কাল হয়ত কার্জন হল, অন্য কোন দিন কোন ছাত্রাবাসে। ঘড়ির কাঁটার মত সময় ধরে এভাবেই তাকে চলতে হয়। নিজের শরীর অচল হয়ে এলেও বিশ্ববিদ্যায়ের সময় সচল রাখার জন্যে তার এই ছোটা ছুটি। তার দম দেয়া ঘড়ির কাঁটা ইতিমধ্যে লক্ষবার ঘুরেছে। আর সেই সঙ্গে এক একটি বছর করে তার নিজের জীবনেরও ৩৮টি বছর কেটে গেছে ক্যাম্পাসে। শামসুদ্দীন আহমদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল ঘড়িতে দম দেন— ঘড়ি বাবু নামে তার পরিচয়।

ঘড়ি বাবু যখন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নেন তখনকার ছাত্রদের অনেকেই বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। কেউ ডীন হয়েছেন, কেউ হলের প্রভোস্ট। তার চোখের সামনে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়। বেড়েছে এর ছাত্র-ছাত্রী, বিভাগ-ফ্যাকাল্টি এবং আবাসিক হল। এ পর্যন্ত ১২/১৪ জন ভাইস চ্যান্সেলর তিনি দেখেছেন। বদলেছে সময়, সেই সঙ্গে বদলেছে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি পরিবেশ। ঘড়ির সময় নিয়ম মাফিক চললেও, ক্যাম্পাসের সময় অনেক সময়ই একেবারে মন্থর হয়ে আসে। কখনও বা তা একেবারেই থমকে দাঁড়ায়।

ঘড়ি বাবু শুধু সময় চালু রাখেননি, সময়ের অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটনাও দেখেছেন। কখনও দেখেছেন মিছিলে মুখরিত ক্যাম্পাস, কনও বা বিক্ষোভে ফেটে পড়া ক্যাম্পাস। এর সব ভালভাবে মনে করতে না পারলেও ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থানসহ অনেক তোলপাড় করা ঘটনার কিছু কিছু স্মৃতি এখনও তার মনকে নাড়া দিয়ে যায়। পাশাপাশি সংঘর্ষ, হানাহানি এবং রক্তপাতও তার চোখে পড়েছে। ঘড়ির টিক টিক শব্দের সঙ্গে বোমা বিস্ফোরণ বা গুলির শব্দ এখন তার কাছে অপরিচিত নয়।

শামসুদ্দীন আহমদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেড়ে ওঠার ইতিহাসের একজন নীরব সাক্ষী। কয়দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে আলাপে তিনি বললেন, সে কাহিনী। শোনালেন নিজের জীবনেরও কথা।

ঘড়িবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চাকরি জীবনের প্রথম দিনগুলোর কথা স্মরণ করে যেন স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনকার আকার-আয়তন দেখে আগেকার অবস্থা অনুমান করা সত্যিই কঠিন। আজ থেকে সুদীর্ঘ ৩৮ বছর আগে ছিল না এখনকার কলা ভবন, রেজিস্ট্রার্স বিল্ডিং। ছাত্র-ছাত্রীদের আড্ডা দেয়া বা মেলামেশার প্রধান জায়গা, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র বা টিএসসি তৈরি হয়নি। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭ হাজারের মত, অথচ তখন এ সংখ্যা ছিল দুই হাজারেরও কম। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল বড় জোর এক শ' জন। ছাত্রদের জন্যে আবাসিক হল ছিল চারটি। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ঢাকা হল (বর্তমানে শহিদুল্লাহ হল), ফজলুল হক হল এবং হিন্দু ছাত্রদের জন্যে জগন্নাথ হল। ঘড়িবাবু জানান যে বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের গেটের ডান পাশে ছিল তখন রেজিস্ট্রার্স অফিস, বাঁয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের কার্যালয়।

এরপর ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। নির্মিত হতে থাকে নতুন নতুন হল। প্রতি বছরই ক্যাম্পাসে নতুন মুখ আসে, এক সময় বিদায়ও নিয়ে যায়। শামসুদ্দীন আহমদের চোখের সামনেই শুরু হয় কলাভবনের ইট-গাঁথা। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে একে একে তৈরি হতে থাকে রোকেয়া হল ইকবাল হল (জহুরুল হক হল), জিন্নাহ হল (সূর্যসেন হল), মহসীন হল, শামসুন্নাহার হল। চারটি থেকে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের সংখ্যা ১৩টি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বেড়ে ওঠার কাহিনী বলতে বলতে এক পর্যায়ে শামসুদ্দীন নিজের জীবনের কথাও বলতে শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নেন ১৯৪৯ সালে। তার কাজ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকয়টি দেয়াল ঘড়িতে দম দেয়া। চাকরি ছিল তখন পার্ট-টাইমার হিসাবে। বেতন সাকুল্যে দেড় শ' টাকা। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়াল ঘড়ি ছিল মাত্র ৪০টি। সপ্তাহে তখন কখনও এক দিন, কখনও বা দু'দিন আসতে হত। তবে সে সময় আরও একটি কাজ তাকে করতে হত। ঘড়ি মেরামত করা।

বাড়ি ঢাকার মীরপুরের সজো নগরে। ছোটবেলায়ই বাবা মারা যান। পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ক্লাস সেভেনের পর লেখা পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। টিকে থাকার জন্যে নেমে পড়তে হয় জীবিকার সন্ধানে। বেছে নেন ঘড়ি মেরামতের কাজ। বাবুবাজারে শিবচরণ বর্মনের দোকানে কাজ শিখতে শুরু করেন। পরে এ দোকানেই চাকরি নেন। এর পর পার্টটাইমার হিসাবে চাকরি নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্বাধীনতার আগে মওলবী বাজারে আলী হোসেন রোডে নিজে একটি দোকান খোলেন ঘড়ি মেরামতের। খন্ডকালীন চাকরির পাশাপাশি এ ঘড়ির দোকানের আয় থেকে তার সংসার মোটামুটি সচ্ছলভাবেই চলে যাচ্ছিল। স্বাধীনতার পর এখানে বড় ধরনের মার্কেট হয়। প্রয়োজনীয় টাকার অভাবে এ মার্কেটে দোকান বরাদ্দ নেয়া তার ভাগ্যে কুলায়নি। তাই ঘড়িতে দম দেয়ার কাজই তার জীবিকা হয়ে দাঁড়ায়।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর ১৯৭৪ সালের, নবেম্বর মাসে শামসুদ্দীন আহমদের চাকরি স্থায়ী করা হয় তিন শ' টাকার স্কেলে। সব মিলিয়ে পেতেন সাত শ' টাকা।

সেই থেকে সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিনই তাকে ক্যাম্পাসে আসতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘড়ির সংখ্যাও বেড়েছে। প্রথমে যখন তিনি ঘড়িতে দম দেয়ার চাকরি নেন তখন ঘড়ি ছিল ৪০টি। আর এখন তিন শ'র মত। তবে এখন এর সবগুলোতে চাবি দিতে হয় না। গত কয়েক বছর ধরে কর্তৃপক্ষ ইলেকট্রোনিক্স ঘড়ির ব্যবহার শুরু করেছেন। এ ধরনের ঘড়ি বর্তমানে আছে ৩০টির মত। মোট তিন শ' ঘড়ির মধ্যে রেজিস্ট্রার বিল্ডিং, কার্জন হল ও কলা ভবনে ঘড়ি আছে এক শ'রও বেশি। সবচেয়ে পুরনো ঘড়িটির অবস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে। এ ঘড়িটির বয়স প্রায় ৪০ বছর এর নির্মাতা আমেরিকার একটি বিখ্যাত ঘড়ি কোম্পানী। বিভিন্ন বিভাগের অফিস, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ বা হলে ইলেকট্রোনিক্স ঘড়ি বসানো হলেও ভাইস-চ্যান্সেলরের অফিস এবং বাসায় এখনও চাবি দেয়া ঘড়ি চলছে। শামসুদ্দীন আহমদ জানালেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে চাবি দেয়া ঘড়িই ভাল সার্ভিস দেয়।

ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিনই তিনি ঘড়িতে চাবি দিতে ক্যাম্পাসে আসেন। গড়ে রোজ ৩০টি ঘড়িতে দম দিতে হয়। অনির্ধারিত ছুটিতে হলগুলো যখন বন্ধ থাকে তখন অনেক সময় ঘড়িতেও তার চাবি দিতে অসুবিধা হয়। চাকরির বয়স বাড়ার সঙ্গে তার বেতনও বেড়েছে। এখন তার পদের নাম সিনিয়র ক্লক উইন্ডার, স্কেলে বেতন পান। মূল বেতন ১৪৬০ টাকা।

দৈনিক বাংলা ॥ শুক্রবার, ২২শে আশ্বিন, ১৩৯৪

নিজের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান যে চকমোগলটুলীতে নানা বাড়িতে থাকেন; স্ত্রী মারা গেছেন ৮১ সালে। ছয়টি সন্তান মারা যাওয়ার পর এখন একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে নিয়ে তার সংসার। ছেলেটি আরমানীটোলা হাইস্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে, মেয়েটি পড়ে আনোয়ারা বেগম মুসলিম হাইস্কুলে। যে বেতন পান তা দিয়ে খেয়ে-পড়ে ছেলে-মেয়ের পড়ার খরচ চালানো বেশ কষ্টকর। সাইকেলে চেপে মোগল টুলী থেকে ক্যাম্পাসে আসেন। সাইকেলে চেপেই ঘুরে ঘুরে ঘড়িতে চাবি দেন। এ সাইকেলটি তার অনেক দিনের সঙ্গী। অবশ্য প্রথম দিকে তার একটি সাইকেল বাড়ি থেকে চুরি হয়ে যায়।

ঘড়িবাবু বললেন : আগে সংঘর্ষ-হানাহানি কম ছিল। বিশেষ করে বোমার শব্দ স্বাধীনতার আগে ক্যাম্পাসে শুনিনি। অথচ এখন ক্যাম্পাসে বোমার শব্দ যেন নিত্যদিনের ঘটনা। নিজেও দু'একদিন এর মধ্যে পড়েছি। কয়েক মাস আগে সূর্যসেন হল এবং মহসীন হলের মধ্যে দু'দল ছাত্রের মারামারি শুরু হলে দৌড়ে রেজিস্ট্রার বিল্ডিং-এ আশ্রয় নেই। তিনি আরও বলেন, খারাপ লাগে যখন শুনি যে ছাত্রদের তিন বছরের পরীক্ষা ছয় বছরেও শেষ হয় না। মোগলটুলী থেকে সাইকেলে ক্যাম্পাসে আসতে প্রায়শঃ ট্রাফিক-জ্যামে আটকে পড়তে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরাও যেন তেমনি এক জ্যামে আটকে পড়েছে।

শামসুদ্দীন আহমদ এ ক্যাম্পাসে তার সুখস্মৃতির কথা মনে করতে গিয়ে ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর মাহমুদ হোসেনের নাম স্মরণ করেন। প্রফেসর মাহমুদ হোসেন তাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। আর্থিক সাহায্য করেছেন। প্রতি ঈদে তার বাসায় দাওয়াত থাকত। নিজে উপস্থিত থেকে খাওয়াতেন।

শামসুদ্দীনের চাকরির বয়স ফুরিয়ে এসেছে। আগামী জুন জুলাইয়ে তাকে চাকরি জীবন থেকে অবসর নিতে হবে।

ষাট বছরের শামসুদ্দীন আহমদ 'জীবন সায়াহ্নে' দাঁড়িয়ে ফেলে আসা দিনগুলোর কথাই মনে করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন যেমন পাল্টে গেছে, তেমনি পাল্টেছে শামসুদ্দীনের জীবন। দম দেয়া ঘড়িগুলোর জায়গা দখল করছে ইলেকট্রোনিক্স ঘড়ি। বিজ্ঞানের এ উৎকর্ষের জন্যেই হয়ত আর কোন শামসুদ্দীনকে ঘড়িবাবু হয়ে ক্যাম্পাসে আসতে হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ইতিহাসে ঘড়িবাবুর নাম লেখা থাকবে না। তবে ঘড়িগুলো তার স্মৃতি নিয়ে আরও কিছুকাল সময় দিয়ে যাবে।